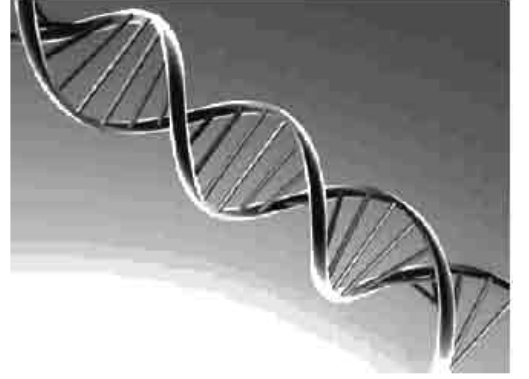
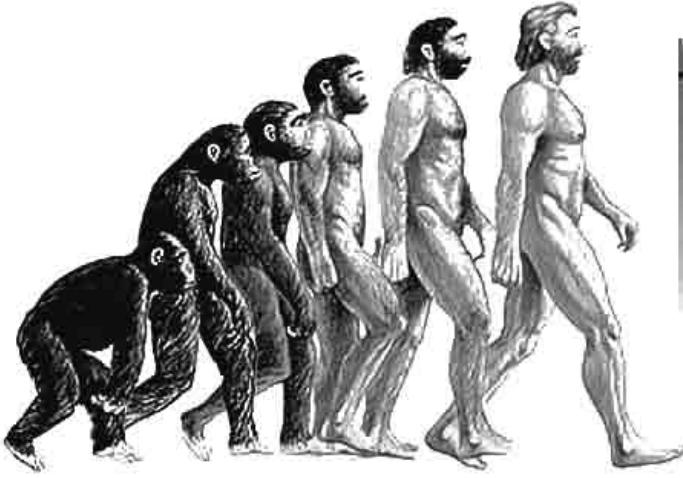


## দ্বাদশ অধ্যায় জীবের বংশগতি ও বিবর্তন

মাতা-পিতার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যাবলী বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। মাতাপিতা থেকে বৈশিষ্ট্য সন্তানে কীসের মাধ্যমে কীভাবে স্থানান্তরিত হয় তা আমরা এ অধ্যায়ে জানতে পারব। এ অধ্যায়ে আমরা আরও জানতে পারব যে- জীবজগতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণি বর্তমান এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষ (Ancestor) থেকে উদ্ভূত হয়ে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- বংশগতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বংশপরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী উপাদানসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় স্থানান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বংশগতির তথ্য স্থানান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- DNA প্রতিরূপ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বংশগতির তথ্য স্থানান্তরে ডিএনএ (DNA)এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- DNA টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লিঙ্গ নির্ধারণে পুরুষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জেনেটিক ডিসঅর্ডারের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।
- বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজাতির টিকে থাকায় বিবর্তনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- মা-বাবার সাথে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয় করতে পারব।
- আমাদের জীবনে ডিএনএ (DNA) টেস্টের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

পৃথিবীর সব জীব তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী প্রজন্মে প্রায় অবিকল স্থানান্তর ও পরিস্ফুটিত হয়। পৃথিবীর সব জীবের ক্ষেত্রেই এই প্রাকৃতিক নিয়ম প্রযোজ্য। তাই আমরা ধান গাছের বীজ থেকে ধান, আমের বীজ থেকে আমগাছ, পাটের বীজ থেকে পাটগাছ জন্মাতে দেখি। এভাবেই বংশানুক্রমে প্রজাতির বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুক্রমে সন্তানসন্ততির দেহে সঞ্চারিত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো “বংশগতি” (Heredity)। বংশগতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ও গবেষণা করা হয় বংশগতিবিদ্যা (Genetics) নামক জীববিজ্ঞানের বিশেষ শাখায়।

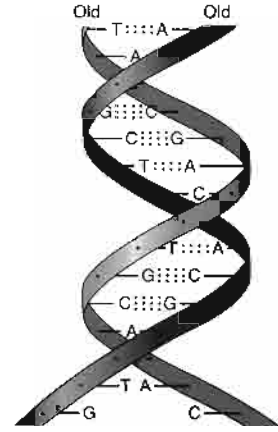
কাজ : মা-বাবার সাথে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত কর এবং ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

বংশ পরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহনকারী উপাদান (বংশগতিবস্তু) : মাতাপিতার বৈশিষ্ট্যাবলী তাদের সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয় বংশগতিবস্তু (Hereditary material) র মাধ্যমে। এগুলো হলো ক্রোমোজোম, জিন, ডিএনএ (DNA) ও আরএনএ (RNA)। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

**ক্রোমোজোম (Chromosome) :** বংশগতির প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্রোমোজোম। এটি নিউক্লিয়ার নিউক্লিওপ্লাজমে বিস্তৃত এবং সূত্রাকার ক্রোমাটিন দ্বারা গঠিত। বিজ্ঞানী Strasburger (১৮৭৫) সর্বপ্রথম ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন। প্রজাতির বৈশিষ্ট্যভেদে কোষে এর ডিপ্লয়েড (দুই সেট ক্রোমোসোম, যার একসেট পিতা থেকে আসে এবং আর একসেট মাতা থেকে আসে) সংখ্যা ২ হতে ১৬০০ পর্যন্ত হতে পারে। একটি ক্রোমোসোম সাধারণত ৩.৫ থেকে ৩০.০ মাইক্রন দৈর্ঘ্য ও ০.২ থেকে ২.০ মাইক্রন প্রস্থে হয়ে থাকে ( $১ \text{ মাইক্রন} = \frac{1}{1000} \text{ মিমি}$ )। ক্রোমোজোমের কাজ হলো মাতাপিতা হতে জিন (যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে) সন্তানসন্ততিতে বহন করে নিয়ে যাওয়া। মানুষের চোখের রং, চুলের প্রকৃতি, চামড়ার গঠন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ক্রোমোসোম কর্তৃক বাহিত হয়ে বংশগতির ধারা অক্ষুণ্ন রাখে। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌতভিত্তি (Physical basis of heredity) বলে আখ্যায়িত করা হয়।

**DNA :** ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান ডিএনএ হলো ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (Deoxyribo Nucleic Acid)। এটি সাধারণত দ্বিসূত্রবিশিষ্ট পলিনিউক্লিওটাইডের সর্পিলাকার গঠন। একটি সূত্র অন্যটির পরিপূরক। এতে পাঁচ কার্বনযুক্ত শর্করা, নাইট্রোজেনঘটিত বেস (এডিনি, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন) ও অজৈব ফসফেট থাকে। এই তিনটি উপাদান কে একত্রে ‘নিউক্লিওটাইড’ বলে। DNA ক্রোমোজোমের স্থায়ী পদার্থ। মার্কিন বিজ্ঞানী Watson ও ইংরেজ বিজ্ঞানী Crick ১৯৫৩ সালে সর্বপ্রথম DNA অনুর Double helix বা দ্বি-সূত্রী কাঠামোর বর্ণনা দেন এবং এ কাজের জন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান। নাইট্রোজেন বেসগুলো দুধরনের। যথা- পিউরিন ও পাইরিমিডিন। এডিনি (A) ও গুয়ানিন (G)- বেস হলো পিউরিন এবং সাইটোসিন (C) ও থায়ামিন (T)-বেস হলো পাইরিমিডিন। একটি সূত্রের এডিনি (A) অন্য সূত্রের থায়ামিন (T) এর সাথে দুইটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত ( $A=T$ ) থাকে এবং একটি সূত্রের গুয়ানিন (G) অন্য সূত্রের সাইটোসিনের (C) এর সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত ( $G \equiv C$ ) থাকে। অর্থাৎ এই বন্ধন সর্বদা একটি পিউরিন ও পাইরিমিডিনের মধ্যে হয়ে থাকে। সুতরাং দুটি সূত্রের একটি অন্যটির পরিপূরক কিন্তু এক রকম নয়। হেলিক্সের প্রতিটি পূর্ণ ঘূর্ণন  $৩৪\text{\AA}$  (Angstrom) দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং একটি পূর্ণ ঘূর্ণনের মধ্যে ১০টি নিউক্লিওটাইড থাকে। সুতরাং পার্শ্ববর্তী দুটি নিউক্লিওটাইডের দূরত্ব (উপর থেকে নিচে)  $৩.৪\text{\AA}$ ।

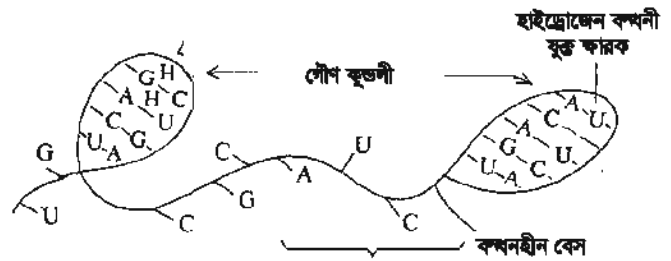
DNA এর দুটি পলিনিউক্লিওটাইড সূত্র বিপরীতভাবে (Antiparallel) অবস্থান করে। অনেকটা প্যাটানো সিঁড়ির ধাপের মতো, স্কারগুলি শায়িত (Flat) ভাবে প্রধান অক্ষের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ DNA অণুর বাইরের দিকের দণ্ড দুটি (প্রধান অক্ষ) পর পর সুগার ও ফসফেট দ্বারা গঠিত এবং এদের ভিতরের দিকে  $N_2$  বেস অবস্থান করে। প্রকৃতকোষেও DNA সূত্র সূতার মতো কিন্তু আদিকোষের DNA সাধারণত গোলাকার হয়ে থাকে এবং এর দৈর্ঘ্য কয়েক মাইক্রন থেকে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটি হাজার হাজার নিউক্লিওটাইডের বা নিউক্লিক এসিডের সমন্বয়ে গঠিত। DNA ডবল হেলিক্সের ব্যাস সর্বত্র  $20\text{\AA}$ । DNA ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান এবং বংশগতির রাসায়নিক ভিত্তি (Chemical basis of heredity)। DNA-ই জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক ও বাহক যা জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সরাসরি বহন করে মাতাপিতা থেকে তাদের বংশধরে নিয়ে যায়।



চিত্র ১২.১ : ডিএনএ

**RNA :** RNA হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড (Ribonucleic Acid)। অধিকাংশ RNA তে একটি পলিনিউক্লিওটাইডের সূত্র থাকে। এতে পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট রাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট এবং নাইট্রোজেন বেস (এডিনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও ইউরাসিল) থাকে। RNA ভাইরাসের ক্রোমোজোমে স্থায়ী উপাদান হিসেবে RNA পাওয়া যায়। কিছু সংখ্যক ভাইরাসের ক্ষেত্রে (যেমন- TMV, Tobacco Mosaic Virus) DNA অনুপস্থিত। অর্থাৎ যে সমস্ত ভাইরাস DNA দ্বারা গঠিত নয় তাদের নিউক্লিক এসিড হিসেবে থাকে RNA। এসব ক্ষেত্রে RNA-ই বংশগতির বস্তু হিসেবে কাজ করে।

**জিন (Gene) :** জীবের সব দৃশ্য ও অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী এককের নাম জিন। এর অবস্থান জীবের ক্রোমোজোমে। ক্রোমোজোমের যে স্থানে জিন অবস্থান করে তাকে 'লোকাস' (Locus) বলে। এক জোড়া প্রতিরূপ ক্রোমোজোমে (Homologous chromosome)

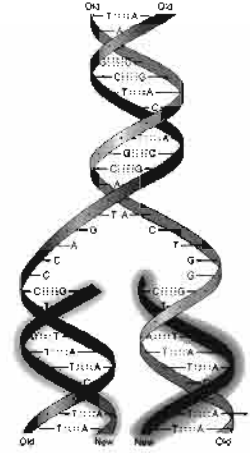


চিত্র ১২.২ : আরএনএ

জিন জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে। সাধারণত একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট জিন থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক জিন মিলিতভাবে একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে। আবার কোনো কোনো সময় একটি জিন একাধিক বৈশিষ্ট্যও নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন গবেষনার তত্ত্ব থেকে জানা গেছে যে, জিনই বংশগতির নিয়ন্ত্রক। বিভিন্ন জীবে জিনের সংখ্যা এক নয়। তবে একই প্রকৃতির জীবে তা প্রায় সবসময় একই থাকে। জিনগুলো সাধারণ নিয়মে ক্রোমোজোমের DNA অনুসূত্রের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পৃথক ও রৈখিকভাবে পরপর সাজানো থাকে।

মাতাপিতা থেকে প্রথম বংশধরে জীবের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য বলে এবং এই প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে জিন দায়ী তাকে প্রকট জিন বলে এবং যে জিনের বৈশিষ্ট্যটি প্রথম বংশধরে প্রকাশ পায় না তবে দ্বিতীয় বংশধরে এক-চতুর্থাংশ জীবে প্রকাশ পায় তাকে প্রচ্ছন্ন জিন বলে। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল ১৮৬৬ সালে মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণাকালে বংশগতির ধারক ও বাহকরূপে যে ফ্যাক্টরের (factor) কথা উল্লেখ করেছিলেন সেটি আজ 'জিন' রূপে পরিচিত হয়েছে। গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয়।

**DNA অনুলিখন (DNA replication):** এই প্রক্রিয়ায় একটি DNA অণু থেকে আর একটি নতুন DNA অণু তৈরি হয় বা সংশ্লিষ্ট হয়। DNA অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতিতে অনুলিপি হয়। এই পদ্ধতিতে DNA সূত্র দুটির হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে গিয়ে আলাদা হয় এবং প্রতিটি সূত্র তার পরিপূরক (Complementary) নতুন সূত্র সৃষ্টি করে। পরে একটি পুরাতন সূত্র ও একটি নতুন সূত্র সংযুক্ত হয়ে DNA অণুর সৃষ্টি হয়। একটি পুরাতন মাতৃ সূত্রক এবং একটি নতুন সৃষ্ট সূত্রকের সমন্বয়ে গঠিত বলে একে অর্ধ-রক্ষণশীল পদ্ধতি বলে। ১৯৫৬ সালে Watson ও Crick এ ধরনের DNA অনুলিখন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব করেন।



চিত্র ১২.৩ : ডিএনএ অনুলিখন

**কাছ :** শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের বড় কাগজে রঙিন পেন্সিল দিয়ে ডিএনএ অংকন করে প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে দিতে বলবেন।

### ডিএনএ টেস্ট

বর্তমান শতাব্দীতে ডিএনএ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ এবং ঔষধ শিল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শী নির্ভর বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি আজ বাংলাদেশেও সুবিচার পাবার এক নতুন উপায় ডিএনএ টেস্ট।

ডিএনএ টেস্টের বিজ্ঞানভিত্তিক এক ব্যবহারিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। এছাড়া ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ টেস্টিং ইত্যাদি নামও প্রচলিত আছে। ডিএনএ টেস্ট সুসম্পন্ন করার জন্যে প্রথম প্রয়োজন জৈবিক নমুনা। ব্যক্তির হাড়, দাঁত, চুল, রক্ত, লালা, বীর্য ইত্যাদি বা টিস্যু মূল্যবান জৈবিক নমুনা হতে পারে। অপরাধস্থল কিংবা অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশাকে (Small profile) তুলনা করা হয় সন্দেহভাজনের কাছ থেকে নেয়া রক্ত বা জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে। এই পদ্ধতিতে প্রথমে নমুনা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডিএনএ আলাদা করে নিতে হয়। পরে একাধিক সীমাবদ্ধ-এনজাইম (Small restriction enzyme) দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হয়। এক বিশেষ পদ্ধতি ইলেকট্রোফোরিসিস (Small electrophoresis) এগারোজ বা পলিএক্রিলামাইড জেল এ ডিএনএ টুকরোগুলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যান্ড আকারে আলাদা করা হয়। এক ধরনের বিশেষ নাইট্রোসেলুলোজ কাগজে রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ ডিএনএ প্রোবের সাথে হাইব্রিডাইজ করে এজ-রে ফিল্মের উপর রেখে অটোরেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে দৃশ্যমান ব্যান্ডের সারিগুলো নির্ণয় করা হয় এবং অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত নমুনার সাথে সন্দেহভাজন নমুনার মিল ও অমিল চিহ্নিত করে তুলনা করা হয়। এই পদ্ধতিটিকে ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং বলা হয়। বর্তমানে পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া (Polymerase chain reaction) বা পিসিআর (PCR) পদ্ধতিতে আরও নিগূনভাবে অল্প নমুনা ব্যবহার করে নির্ভুল ভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

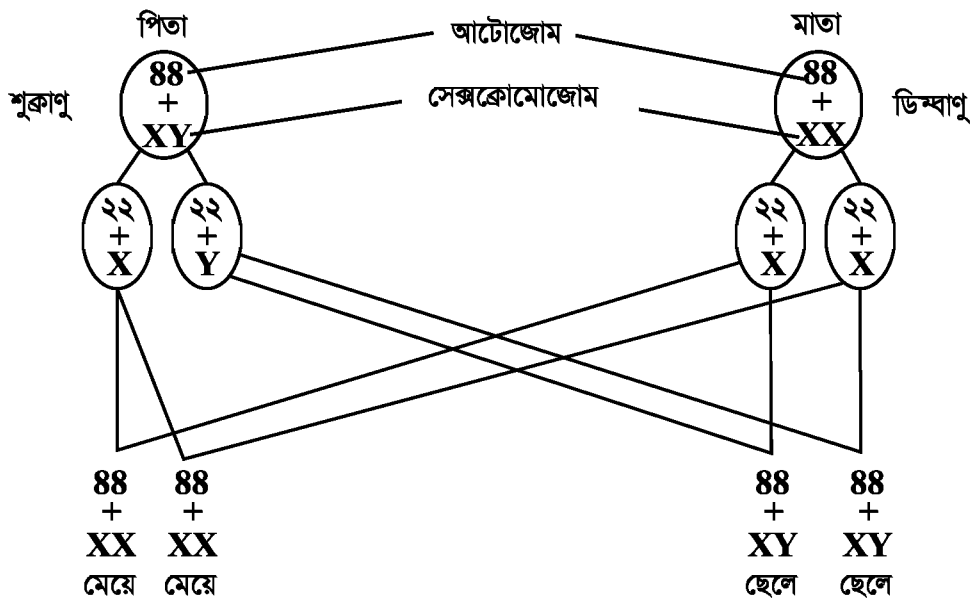
### মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ

মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে প্রায় একই পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ হয়। মানবদেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা ৪৬ বা ২৩ জোড়া, এর মধ্যে ৪৪ টিকে বা ২২ জোড়াকে অটোজোম (Autosome) এবং ১ জোড়াকে সেক্স-ক্রোমোজোম (Sex chromosome) বলা হয়। অটোজোমগুলি শারীরবৃত্তীয়, ভ্রূণ ও দেহ গঠন ইত্যাদি কার্যাদিতে অংশগ্রহণ করে, লিঙ্গ নির্ধারনে এদের কোনো ভূমিকা নেই। সেক্স ক্রোমোজোম দুটি এজ (X) এবং ওয়াই (Y) নামে পরিচিত। লিঙ্গ নির্ধারনে এরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়ে কোষে দুটি সেক্স ক্রোমোজোমই X ক্রোমোজোম অর্থাৎ XX। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে একটি X অপরটি Y ক্রোমোজোম অর্থাৎ XY। X এবং Y উভয় ধরনের সেক্স-ক্রোমোজোমই আকৃতিতে লম্বা এবং রডের মতো, তবে Y ক্রোমোজোম X ক্রোমোজোমের তুলনায় কিছুটা ছোট। স্ত্রীলোকদের ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু সৃষ্টির সময় যখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটে তখন প্রতিটি ডিম্বাণু অন্যান্য ক্রোমোজোমের সাথে একটি করে X ক্রোমোজোম লাভ করে। অপরপক্ষে, পুরুষে শুক্রাণু সৃষ্টির সময় অর্ধেক সংখ্যক শুক্রাণু একটি করে X ক্রোমোজোম এবং অবশিষ্ট অর্ধেক শুক্রাণু একটি করে Y ক্রোমোজোম লাভ করে। ডিম্বাণু পুরুষের X বা Y বহনকারী যে কোনো একটি শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হতে পারে। ফলে জাইগোট দুটি X অথবা একটি X এবং একটি Y ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হতে পারে। দুটি X নিয়ে অর্থাৎ XX নিয়ে যে শিশু জন্মাবে সে হবে একটি মেয়ে, আর যে শিশু একটি X এবং একটি Y অর্থাৎ XY ক্রোমোজোম নিয়ে পৃথিবীতে আসবে সে হবে একটি ছেলে।

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের কলা কৌশল ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কন্যা বা পুত্রসন্তানের জন্ম হবার ব্যাপারে মায়ের আদৌ কোনো ভূমিকা নেই। কারণ মা সব সময় কেবলমাত্র X বহনকারী ডিম্বাণু তৈরি করে। অপরদিকে পিতা X এবং Y উভয় ধরনের শুক্রাণু উৎপাদন করে। গর্ভধারণকালে কোন ধরনের শুক্রাণু মাতার X বহনকারী ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হবে তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সন্তানের লিঙ্গ। যেহেতু নিষেকে কেবলমাত্র একটি শুক্রাণুই ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয় তাই পিতার X অথবা Y শুক্রাণুর কোনটি সাফল্যজনকভাবে নিষেক ঘটাবে তার উপর নির্ভর করে সন্তানের লিঙ্গ। যদি X বহনকারী শুক্রাণু নিষেক ঘটায় তাহলে জাইগোট হবে XX, অর্থাৎ সন্তান হবে কন্যা। আর যদি Y বহনকারী শুক্রাণু নিষেকে অংশগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে জাইগোটে X এবং Y ক্রোমোজোম থাকবে অর্থাৎ ক্রোমোজোম দুটি হবে XY। ফলে শিশু যথারীতি পুত্র সন্তান হবে। অঙ্গতর জন্য কন্যা-সন্তান প্রসব করায় অনেক সমাজে মাকেই দায়ী করে। এজন্য তাকে অনেক সময় গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়। যদিও এটি একটি নিছক দৈবঘটনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তবুও দায়ী যদি কাউকে করতেই হয় তা করতে হবে পিতাকে, মাতাকে নয়।

চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো—



চিত্র ১২.৪ : মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ

কাজ: সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে নিচের ছক পূরণের মাধ্যমে তা নির্ণয় কর।					
♀ মা	♂ বাবা	X	Y	X	Y
X		XX মেয়ে			XY ছেলে
X					
X					
X					

### জেনেটিক ডিসঅর্ডার বা বংশগতি ব্যাধি/অস্বাভাবিকতা

#### কালার ব্লাইন্ড বা বর্ণান্ধতা

কালার ব্লাইন্ড বা বর্ণান্ধতা এমন এক অবস্থা যখন কেউ কোনো রঙ সঠিকভাবে চিনতে পারে না। রঙ চিনতে আমাদের চোখের স্নায়ু কোষে রঙ সনাক্তকারী পিগমেন্ট থাকে। কালার ব্লাইন্ড অবস্থায় রোগীদের চোখে স্নায়ু কোষের রঙ সনাক্তকারী পিগমেন্টের অভাব থাকে। যদি কারো একটি পিগমেন্ট না থাকে তখন সে লাল আর সবুজ পার্থক্য করতে পারে না। এটা সর্বজনীন কালার ব্লাইন্ড সমস্যা। একাধিক পিগমেন্ট না থাকার কারণে লাল ও সবুজ রঙ ছাড়াও রোগী নীল ও হলুদ রঙ পার্থক্য করতে পারে না। সাধারণত প্রতি ১০ জনে ১ জন পুরুষ কালার ব্লাইন্ড হতে দেখা যায়। তবে খুব কম মহিলারাই এই অসুখে ভোগেন।

বংশগতি ছাড়াও কোনো কোনো ঔষধ যেমন- বাত রোগের জন্য হাইড্রক্সি-ক্লোরোকুইনিন সেবনে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে চোখের রক্তিক পিগমেন্ট নষ্ট হয়ে রোগী কালার ব্লাইন্ড হতে পারে। এই ধরনের অসুখ নির্ণয়ে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া শ্রেয়।

#### থ্যালাসেমিয়া

থ্যালাসেমিয়া রক্তের লোহিত রক্ত কণিকার এক অস্বাভাবিক অবস্থাজনিত রোগের নাম। এই রোগে লোহিত রক্ত কণিকাগুলো নষ্ট হয়। ফলে রোগী রক্ত শূন্যতায় ভোগে। এই রোগ বংশ পরম্পরায় হয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বংশবাহিত রক্তজনিত সমস্যা। ধারণা করা হয় দেশে প্রতিবছর ৭০০০ শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে এবং বর্তমানে প্রায় এক লাখ রোগী আছে।

লোহিত রক্তকোষ দুধরনের প্রোটিন দ্বারা তৈরি,  $\alpha$ -গ্লোবিউলিন এবং  $\beta$ -গ্লোবিউলিন। থ্যালাসেমিয়া হয় লোহিত রক্ত কোষে এ দুটি প্রোটিনের জিন নষ্টের কারণে। ফলে ত্রুটিপূর্ণ লোহিত রক্তকোষ উৎপাদিত হয়। দুধরনের থ্যালাসেমিয়া দেখা যায়। আলফা ( $\alpha$ ) থ্যালাসেমিয়া রোগ তখনই হয় যখন  $\alpha$ -গ্লোবিউলিন তৈরির জিন অনুপস্থিত থাকে কিংবা পরিবর্তিত হয়। এই ধরনের রোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, চীন ও আফ্রিকার জনগনের মাঝে বেশি দেখা যায়। অণুরূপভাবে বিটা ( $\beta$ ) থ্যালাসেমিয়া তখনই হয় যখন  $\beta$ -গ্লোবিউলিন প্রোটিন উৎপাদনে ব্যাহত হয়। এ ধরনের রোগ ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকাবাসীদের মাঝে বেশি দেখা গেলেও কিছু পরিমাণ আফ্রিকান, আমেরিকান, চীন ও এশিয়াবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়।

বিটা থ্যালাসেমিয়াকে ‘কুলির থ্যালাসেমিয়া’ও বলা হয়। জীনের প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে থ্যালাসেমিয়াকে দুভাবে দেখা হয়। থ্যালাসেমিয়া মেজরের ক্ষেত্রে শিশু তার বাবা ও মা উভয় থেকে থ্যালাসেমিয়া জিন পেয়ে থাকে। থ্যালাসেমিয়া মাইনরের ক্ষেত্রে শিশু থ্যালাসেমিয়া জিন তার বাবা অথবা তার মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। এ ধরনের শিশুরা থ্যালাসেমিয়ার কোনো উপসর্গ দেখায় না তবে থ্যালাসেমিয়া জিনের বাহক হিসেবে কাজ করে।

#### লক্ষণ:

তীব্র থ্যালাসেমিয়ার কারণে জন্মের পূর্বেই মায়ের পেটে শিশুর মৃত্যু হতে পারে। থ্যালাসেমিয়া মেজর আক্রান্ত শিশুরা জন্মের পর প্রথম বছরেই জটিল রক্তশূন্যতা রোগে ভোগে।

#### চিকিৎসা:

সাধারণত নির্দিষ্ট সময় পর পর রক্ত প্রদান ও নির্দিষ্ট ঔষধ খাইয়ে থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা দেয়া হয়। রোগীদের লৌহ সমৃদ্ধ ফল বা ঔষধ খেতে হয় না, কারণ তা শরীরে জমে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে। থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগীদের ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। এছাড়া যকৃৎ নষ্ট হলে অন্যান্য অসুখ এবং জডিস দেখা দেয়।

#### জৈব বিবর্তন তত্ত্ব

এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যে মহাবিশ্বে জীবনের স্পন্দন শুধুমাত্র এই পৃথিবীতেই দেখা যায়। পৃথিবীতে বর্তমানে যত জীব রয়েছে তারা বিভিন্ন সময়ে এই ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছে। আবার অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী সময়ের আবর্তে লুপ্ত হয়ে গেছে। ডাইনোসর আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। আবার কোনো কোনো জীব ধীর পরিবর্তন ঘটিয়ে এখনও টিকে আছে। কয়েক হাজার বছর সময়ের ব্যাপকতায় জীব প্রজাতির পৃথিবীতে আবির্ভাব ও টিকে থাকার জন্যে যে পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রক্রিয়া তাকে জৈব বিবর্তন (Organic evolution) বলে।

চার্লস রবার্ট ডারউইন একজন ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৮৩১ সালে তিনি এইচ. এম. এস. বিগল (H. M.S. Beagle) জাহাজের একজন প্রকৃতিবিদ হিসেবে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং জাহাজে বিশ্বের অনেক স্থান ভ্রমণ করেন। তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপ, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, মালদ্বীপ, ব্রাজিল ও গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে প্রায় পাঁচ বছর ধরে পরিভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করেন।

পরবর্তীতে টমাস ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪)-এর জনসংখ্যা তত্ত্ব পাঠ করে ডারউইন প্রাণীকুলের প্রকৃতিতে সঞ্চার করে বৈচিত্র্য থাকার উপর চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। ম্যালথাস মনে করতেন পৃথিবীতে মানব জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি অসুস্থতা ও সীমিত খাদ্য সরবরাহের কারণে ব্যাহত হয়। ব্রুনাই বসবাসরত প্রকৃতিবিদ আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস প্রাণী-জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণতত্ত্বে তাঁর মতামতগুলো ডারউইনকে ১৮৫৮ সালে লিখে পাঠান যা ডারউইনকে তাঁর নিজের মতবাদসমূহ প্রস্তাব করতে অনুপ্রেরণা দেয়। পরে ১৮৫৮ সালে ১ জুলাই লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাণী-জনসংখ্যার পরিবর্তনের উপর ওয়ালেস ও তার নিজের অভিমতগুলি পেশ করে ডারউইন আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ১৮৫৯ সালে তার *The Origin of Species by Means of Natural Selection* বইটি প্রকাশিত হয়। বইটির ১২০০ কপির সবগুলি প্রথম দিনেই বিক্রি হয়ে যায়।

**ভারউইন ও ওয়াগেলের বিবর্তনতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিচে উল্লেখ করা হলো:**

**জীবজগতে ভিন্নতা (Variation) :** ভারউইন লক্ষ করেছিলেন যে, পৃথিবীতে দুটি প্রাণী বা প্রাণীগোষ্ঠী সম্পূর্ণভাবে এক রকম নয়। একই প্রজাতির মধ্যে এমনকি একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। ভারউইনের মতে অবিরাম সঙ্ক্রামের ফলে, নিজেকে রক্ষার জন্যে নানা রকম শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলে জীব জীব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। নিচে কুকুর প্রজাতির মাঝে ভিন্নতা দেখানো হয়েছে।



চিত্র ১২.৫: কুকুর প্রজাতির ভিন্নতা

**জীবের অভ্যাবিক প্রজননের প্রবণতা :** প্রকৃতিতে প্রতিটি জীবের প্রজনন ক্ষমতা, জন্মহার ও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার সংখ্যা পার্থক্য রয়েছে। প্রজনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে এটি জীবের সহজাত ক্ষমতা। এর ফলে বেঁচে থাকা প্রাণী অপেক্ষা প্রজননকৃত প্রাণীর সংখ্যা বহুগুণ বেশি হয়। একটি কাতলা মাছ চট্টগ্রামের হালদা নদীতে এক ঋতুতে প্রায় ৩ থেকে ৫ লক্ষ ডিম দিয়ে থাকে। অনুকূল পরিবেশে এখান থেকে জন্ম নেয়া পোনার মাত্র কয়েক হাজার মাছ বেঁচে থেকে বড় হবার সুযোগ পেয়ে থাকে। তেমনি প্রাপ্ত বয়স্ক একটি ইলিশ মাছ মেঘনা নদীর অববাহিকায় আকার তেড়ে প্রায় ৩.০ থেকে ১০ লক্ষ পর্যন্ত ডিম ছেড়ে থাকে। খারপা করা হয়, অনুকূল পরিবেশে খুব জল্প সংখ্যক জাটকা শেষ পর্যন্ত বেঁচে থেকে বড় ইলিশ হতে পারে। মেঘনাতী প্রাণীর মধ্যে হাড়ির প্রজনন সবচেয়ে ধীর গতিতে হয়। ভারউইন হিসাব করে দেখান যে এক জোড়া হাড়ি থেকে জন্ম নেওয়া সব হাড়ি যদি বেঁচে থাকে, আর তারা যদি সবাই প্রজননক্ষম হয় তাহলে ৭৫০ বছরে হাড়ির সংখ্যা হবে ১৯ লক্ষ। কিন্তু প্রকৃতিতে তা দেখা যায় না। উদাহরণগুলি থেকে এটা স্পষ্ট যে, যদি কোনো প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্রিত ভাবে অব্যাহত থাকত, তবে যেকোনো একটি প্রজাতি কয়েক বছরে সারা পৃথিবী ভরে ফেলত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় না। মানবসৃষ্ট কারণে যেমন, অতিরিক্ত আহরণ, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি প্রকৃতিতে নানাভাবে জনসংখ্যা (Population) নিয়ন্ত্রণ করে। খারপা করা বায় প্রকৃতিতে সুই গোলা বা জাটকা নিধন না হলে, উপযুক্ত পরিবেশ পেলে আমাদের নদনদীতে রুই, কাতলা বা ইলিশ মাছের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যেতে পারত।



**জীবের বাঁচার সংগ্রাম (Struggle for existence) :** ডারউইন যুক্তি উত্থাপন করেন যে, যেহেতু প্রতিটি প্রাণী অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি পরিমাণে সন্তান জন্ম দেয়, সেহেতু বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীর মধ্যে সংগ্রাম অবধারিত। আর এই সংগ্রাম মূলতঃ খাদ্য, বাসস্থান ও প্রজনন ক্ষেত্রে কেন্দ্র করে। জীবের টিকে থাকার ব্যাপারে নিচের বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচ্য:

১. প্রতিটি প্রাণীর জন্যে খাদ্য ও বসবাসযোগ্য স্থান সীমিত। এর ফলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার বহু প্রাণী খাদ্যাভাবে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। দেখা গেছে কোনো দ্বীপাঞ্চলে হরিণ ছাড়া হলে ওরা বড় হয়, বংশ বৃদ্ধি করে ও সংখ্যায় দ্রুত বেড়ে যায়। পরে অতিরিক্ত হরিণ গাছের পাতা বা ঘাস খেয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে অনাহারে তাদের মড়ক দেখা দেয় এবং হরিণ সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।
২. পৃথিবীতে প্রতিটি প্রাণী জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে আন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা যেমন, রুইমাছ-রুইমাছে, বিড়াল-বিড়ালে কিংবা বানর-বানরে সংগ্রাম অথবা ভিন্ন দুটি প্রজাতির মধ্যে অর্থাৎ আন্তঃপ্রজাতিক প্রতিযোগিতা যেমন সাপ-বেজী, প্রজাপতি-মৌমাছি ইত্যাদি পারস্পরিক সংগ্রামে লিপ্ত।
৩. প্রতিটি প্রাণী প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করছে। বন্যা, খরা, ঝড়, বৃষ্টি, অত্যধিক গরম, শীত, আগ্নেয়গিরি, সুনামি, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি একটি পরিবেশের জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু জীবের জীবন ধ্বংস হয়। সুতরাং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

**প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) :** ডারউইনের মতে জীবন-সংগ্রামে সেই সব প্রাণী সাফল্য লাভ করে যাদের শারীরিক গঠন প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়। তারা পরিবর্তনশীলতায় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে অভিযোজিতগুণগুলো বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে বেঁচে থাকার বা বিবর্তনের প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। অন্যদিকে যারা এ ধরনের পরিবর্তনশীলতায় অংশগ্রহণ করতে পারে না তারা প্রকৃতি কর্তৃক মনোনীত হয় না। ফলে তাদের বিলুপ্তি ঘটে। প্রাচীনকালের প্রাণী ডাইনোসর বলিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশের সঙ্গে সূষ্ঠভাবে অভিযোজিত না হতে পারায় বিলুপ্ত হয়েছে।

**যোগ্যতমের টিকে থাকা (Survival of the fittest) :** যে বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও প্রবৃত্তি জীব বা তার বংশধরকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে তোলে, সেসব অনুকূল বৈচিত্র্যের অধিকারী হয়। এই গুণাবলী বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, প্রতিকূল বৈচিত্র্য সম্পন্ন জীব, জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে কালক্রমে ধ্বংস হয়। ডারউইন জীবজগতে এ ধরনের অভিযোজনকে প্রকৃতিতে বাঁচার সংগ্রামে টিকে থাকার প্রধান অবলম্বন বলে মনে করেছেন। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী এমন কিছু অভিযোজনের অধিকারী হয়, যা তাদের বেঁচে থাকার জন্য বিশেষ সহায়ক। মরুভূমিতে অনেক গাছের পানি সঞ্চার করার কৌশল, প্রাণীর আত্মরক্ষায় ছদ্মবেশ (Mimicry) কিংবা অনুকৃতির আশ্রয় নেয়। এই অভিযোজনগুলি অভিব্যক্তির উল্লেখযোগ্য উপাদান।

### প্রজাতির টিকে থাকায় বিবর্তনের গুরুত্ব

বিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজাতির উদ্ভবকালে দেখা যায় অনেক প্রজাতি কালের গর্ভে হারিয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে ডাইনোসরের কথা বলা যায়। দেখা গেছে যে সময়ের সাথে যে প্রজাতিটির টিকে থাকার ক্ষমতা যত বেশি সে বিবর্তনের আবর্তে তত বেশিদিন টিকে থাকতে পারে। অর্থাৎ যে পরিবেশ, জীবন প্রবাহ ও জনমিতির মানদণ্ডে বিবর্তনে যে যত বেশি খাপ খাওয়াতে পারবে সেই প্রজাতিটি টিকে থাকবে। এটিকে অনেক ক্ষেত্রে অভিযোজন বলা হয়।

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. RNA কী?
২. জিন কী?
৩. ক্রোমোমোম কে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলা হয় কেন?
৪. অটোসেম কী?
৫. থ্যালাসেমিয়া বলতে কী বুঝায়?

### রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। DNA অনুলিখন কীভাবে হয় চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা কর।

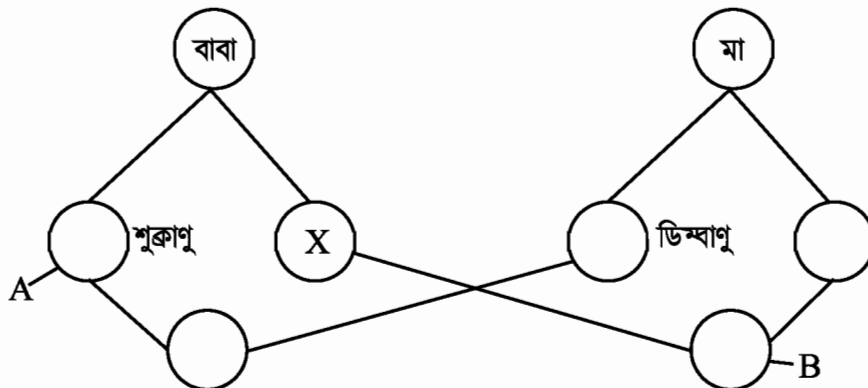
### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউরাসিল কোথায় পাওয়া যায়?  
 ক. ডি. এন. এ                      খ. আর. এন. এ  
 গ. জিন                              ঘ. লোকাস
২. আর. এন. এ তে থাকে—  
 i. রাইবোজ শর্করা  
 ii. অজৈব ফসফেট  
 iii. নাইট্রোজেন ঘটিত বেস

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i                                      খ. i ও ii  
 গ. ii ও iii                            ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্রের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও



- ফর্ম-২৩, জীববিজ্ঞান ৯ম-১০ম